'শ্মশানের পথে' থেকে 'চৈতালী-ঘূর্ণি'——রূপান্তরের স্বরূপ ও প্রকৃতি।

(এক)

'চৈতালী-ঘূর্ণি' ধারাবাহিকভাবে 'উপাসনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সালের নভেম্বর (কার্তিক, ১৩৩৬) থেকে ১৯৩০ সালের এপ্রিল (চৈত্র, ১৩৩৬) পর্যন্ত ছয় মাসে। ১৯৩১ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটির বীজ নিহিত ছিল ১৯২৮ সালে 'কালি-কলম' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্মশানের পথে' গল্পে। এ-বিষয়ে তারাশংকর লিখেছেন — "এ গল্পটিই আমার জীবনের ভবিষ্যৎ-পথের প্রথম মাইল-পোস্ট। গল্পটি পরবর্তীকালে 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাস হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছে।"[১]

সাহিত্য-জগতে আসার আগে তারাশংকর দীর্ঘকাল রাজনীতি-চর্চা করেছেন। রাজনীতির পথে তিনি যা পাননি, সাহিত্যের পথে তিনি সেই লক্ষ অর্জন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেছেন। ১৯২৪-২৫ সালে তিনি মহামারী-ক্লিষ্ট গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরেছেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ করেছেন। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। তার আগেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে রাজনৈতিক আন্দোলনে আর ফিরে যাবেন না। তখন থেকে তিনি সক্রিয় রাজনীতি চিরদিনের জন্য ছেড়েছেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে রাজনীতির পরোক্ষ সংযোগ বজায় ছিল।

"তারাশঙ্করের চেতনা-লোকে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার-ভাঁটা, ঘাত-প্রতিঘাত আর অন্তর্দ্বন্দ্বের ছায়া পড়েছে গোড়া থেকেই।"[২] 'শ্মশানের পথে' গল্পটি 'কালি-কলম' পত্রিকায় বেরিয়েছিল ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে। লেখা নিশ্চয়ই হয়েছে তারও কিছু আগে। ১৯২৮ সালের পূর্ববর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা গল্পটির মূলে নিহিত।

সময়টা ছিল আমাদের জাতীয় জীবনের এক ক্রান্তিকাল। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়েছিল। তখন থেকে '১৯২৭ পর্যন্ত কাল-পর্বে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ভাঁটার টান।'[৩] সাম্রাজ্যবাদ তখন মরিয়া, জাতীয় মুক্তির শক্তি স্তিমিত। সুভাষচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Indian Struggle : 1920-1942' —এ এই পরিস্থিতিকে 'national calamity' বা 'জাতীয় দুর্যোগ' বলে বর্ণনা করেছেন।

এই সূত্রে 'শ্মশানের পথে' গল্পটি রচনার পূর্ববর্তী ও সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে সংক্ষেপে।

১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে যাবার ফলে জনগণের মনে অবসাদ ও হতাশা নেমে আসে এবং ভারতীয় রাজনীতিতে কর্মবিমুখতা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে স্বরাজ্যদল আইনসভায় প্রবেশের কর্মসূচী গ্রহণ ক'রে ও দৃঢ় বাধাদান নীতি অনুসরণ ক'রে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে প্রাণবন্ত ও গতিশীল ক'রে তোলে। রজনী পাম দত্তের মতে—গান্ধীজীর নিষ্ক্রিয় আন্দোলন-বিমুখতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাজ্যদলের কর্মসূচী ছিল এক অগ্রবর্তী ও প্রগতিশীল পদক্ষেপ। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর নানা কারণে স্বরাজ্যদলের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে। স্বরাজ্যদলের ব্যর্থতার ফলে ১৯২৭ সাল থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনের সমন্বয় সাধন ক'রে ভারতে হিন্দু ও মুসলমান —— এই দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সেতু গড়তে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ায় এবং গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের ফলে যে অনিশ্চয়তা ও অবসাদ দেখা দিল তার ফলে বিভেদপন্থী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি পুনরায় সক্রিয় হ'য়ে উঠল।

১৯২৩ সাল থেকেই কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের ঐক্যের ক্ষেত্রে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং কংগ্রেস-পরিচালিত বৃহত্তর রাজনৈতিক স্রোতোধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে মুসলীম লীগ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আদর্শ অনুসরণ করতে সচেষ্ট হন। ১৯২৬ সাল নাগাদ সারা দেশ জুরে অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়— 'The history of 1926 is largely a history of Hindu-Muslim strife.' [৪] উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী ও শহরের সমাজবিরোধারা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় মুখ্য ভূমিকা নেয়।

এই সময়কালে যদিও কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না তবু রাওয়তারি অঞ্চলে কংগ্রেস তুলনামূলকভাবে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। কারণ এখানে সরকার কর্তৃক ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির হার সর্বস্তরের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। ১৯২৮ সালে গুজরাটের সুরাট জেলার বারদৌলি তালুকে কংগ্রেস ও কৃষক আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। এই অঞ্চলে আন্দোলন গান্ধীজী-নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয়েছিল। এখানকার উচ্চবিত্ত পটিদার কৃষক সম্প্রদায় এই আন্দোলন পরিচালনায় মুখ্য সামাজিক শক্তি ছিল।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এ-সময় খারাপ হ'তে থাকে। কৃষি ও শিল্প — উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন কমতে থাকে। এছাড়া, বিশ্বের বাজারে কাঁচামালের দাম কমে যাওয়ায় ১৯২৬-২৭ সালে ভারতের মোট রপ্তানির পরিমাণ পূর্বের বৎসরের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ কম হয়। ১৯২৫-২৬ সালে মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৮৫ কোটি টাকা, ১৯২৬-২৭ সালে এ পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়াল ৩০১ কোটি টাকা। এদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশা বৃদ্ধি পেল। শ্রমিক অসন্তোষের প্রতিফলন পাওয়া যায় ধর্মঘটের মধ্যে। ১৯২৬ সালের তুলনায় ১৯২৭ সালে ধর্মঘটের ফলে দ্বিগুণ শ্রমদিবস নষ্ট হয়। ১৯২৮ সালে ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করে। ভারতের শিল্পজীবন ছিল অশান্ত। আর্থিক

দুর্দশার ফলে জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করল, অন্যদিকে ভারতীয় রাজনীতিতে এই সময় থেকে সাম্যবাদী আন্দোলন সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে কমিউনিস্ট দল ও নেতাদের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মাদ্রাজ কংগ্রেসে সাইমন কমিশন বয়কটের পাশাপাশি খাজনা বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে গণ-আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এ-সময় নানাস্থানে খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু হ'ল। এই আন্দোলনগুলির মূল কারণ হ'ল জমিদারদের শোষণ। বিশের দশকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমশ নিম্নগামী হ'ল। ১৯২১-এর জনগণনায় দেখা যায় যে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছিল। অথচ কৃষি-পণ্যের উৎপাদনের হার সে-তুলনায় থমকে দাঁড়িয়েছিল। প্রতি একরে যে ফসল উৎপাদিত হচ্ছিল তা পূর্বের উৎপাদনের তুলনায় কম। ওদিকে শ্রমিকদের ছাঁটাই, মজুরি কম পাওয়া প্রভৃতি সমস্যার মুখোমুখি হ'তে হচ্ছিল। ভারতীয় ও ব্রিটিশ পুঁজিপতিশ্রেণী বাণিজ্যিক মন্দার বোঝা চাপাচ্ছিল মজুর শ্রেণীর ঘাড়ে।

কংগ্রেস কৃষকদের দাবী-দাওয়া পূরনের আন্দোলনে তেমন সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দেয়নি। এ-বিষয়ে অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেছেন —— "The strong links of congressmen —— whether Swarajists or No-changers —— with Zamindari or intermediate tenure-holding made it generally unresponsive to peasant demands for rent-reduction and share-cropper efforts at a fairer division of the harvest in Bengal, Bihar and U.P."[৫]

বিশেষ ক'রে বাংলায় ফসলের ভাগের বা বর্গার দাবী তীব্র হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু জমির ওপর বর্গাদারের দাবী স্বরাজ্যদলের নেতারা মানেননি।

বিশের দশকে-র মাঝামাঝি সময়ে গড়ে-ওঠা নমশূদ্র ও মুসলমান বর্গাদারদের আন্দোলনের প্রতি তাঁদের কোনো সমর্থন বা সহানুভূতি ছিল না।

এই সময়বৃত্তের উল্লেখ্য দিক হ'ল — ভারতীয় রাজনীতিতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিস্তার। গান্ধীজীর নেতৃত্বে গড়ে-ওঠা অহিংস জাতীয় আন্দোলনের সার্থকতা বিষয়ে যাঁরা হতাশ হ'য়ে পড়েছিলেন, তাঁরা বেশি ক'রে কমিউনিষ্ট ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'যুগান্তর'— গোষ্ঠীর প্রাক্তন বিপ্লবী নরেন ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়) মেক্সিকোতে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করেন এবং ১৯২০ সালে রাশিয়া যান দ্বিতীয় কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকে যোগ দিতে। ১৯২০ সালেই মানবেন্দ্রনাথ, অবণী মুখার্জি, মহম্মদ আলী, মহম্মদ সফিক প্রমুখ মিলে তাশখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সৃষ্টি করেন। ১৯২২ সালে মানবেন্দ্রনাথ চলে যান বার্লিনে। সেখান থেকেই তিনি 'Vanguard of Indian Independence' নামক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২২ সালের শেষ নাগাদ অসহযোগ আন্দোলন বা খিলাফৎ আন্দোলন সম্পর্কে মোহভঙ্গ হয়েছে এমন কিছু উল্লেখ্য ব্যক্তির মাধ্যমে মানবেন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন বিস্তারে প্রয়াসী হন। যেমন — বোম্বাইতে এস, এ, ডাঙ্গে, কলকাতায় মুজফ্ফর আহ্মদ, মাদ্রাজে শিঙ্গারাভেলু, লাহোরে গুলাম হুসেন। বামপন্থী পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হ'তে থাকে। যেমন, কলকাতায় 'আত্মশক্তি' ও 'ধূমকেতু' ও গুন্টুরে 'নবযুগ'। ১৯২২ সাল থেকে ডাঙ্গে বোম্বাই থেকে সাপ্তাহিক 'Socialist' কাগজটি বের করতে থাকেন। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন গোষ্ঠীগুলি জাতীয় আন্দোলনের মূলধারার মধ্যে থেকেই সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোসনীতির সমালোচনা করে গেছে। ১৯২৫-২৬ সালে মুজফ্ফর আহমদের প্রয়াসে এবং কবি নজরুল ইসলাম, কুতুবুদ্দিন আমেদ ও চিত্তরঞ্জনের প্রাক্তন সেক্রেটারি হেমন্তকুমার সরকারের সহযোগিতায় 'Peasants and Workers' party'—র জন্ম হয়। ১৯২৯ সালে অনুশীলন গোষ্ঠীর দুই

প্রাক্তন কর্মী গোপেন চক্রবর্তী ও ধরণী গোস্বামী ঐ দলে যোগ দেন এবং 'লাঙ্গল' ও 'গণবাণী' ব'লে দু'টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পাঞ্জাবে প্রকাশিত হয় 'কীর্তি' পত্রিকা। বোম্বাই থেকে বের হয় 'ক্রান্তি'। ১৯২৬ সাল নাগাদ শ্রমিক আন্দোলনের ওপর কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাব বাড়তে থাকে। বিশেষ করে বোম্বের কাপড়কলের শ্রমিকদের ওপর। কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মসূচীর দলিলপত্র থেকে জানা যায় যে জমিদারী ব্যবস্থার অবসান এবং জমির মালিকানার মৌলিক পরিবর্তনের দাবী বিশেষভাবে করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে কংগ্রেস বহু দ্বিধার পর এই দু'টি দাবী তাদের আন্দোলনের অঙ্গীভূত করে তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ভারতে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয় এবং তা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার একাধিক দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৈপ্লবিক প্রয়াসে ভাঁটা পড়ে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন শেষ হবার কিছু পরেই বাংলা ও উত্তর ভারতে বিপ্লবী প্রচেষ্টা আবার শুরু হয়। এ-পর্যায়ে বিপ্লবীরা সশস্ত্র আন্দোলনের কার্যপন্থাটি গ্রহণ করেন এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন।

অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার কিছু পরেই ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে গোপনে অনুষ্ঠিত বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনে বিপ্লবীগণ মিলিত হন এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এদিকে ১৯২২ সালের মার্চে ভারতীয় সংবাদপত্র আইন বাতিল হওয়ার ফলে বাংলায় বৈপ্লবিক পত্র-পত্রিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। বিপ্লবীরা কংগ্রেস সংগঠনেও বিশেষ অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়। চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বৈপ্লবিক সংস্থা ও বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন।

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পুনরাবির্ভাবে ব্রিটিশ সরকার এক দমনমূলক সামরিক আইন জারি করেন। এ আইন অনুসারে শুধু সন্ত্রাসবাদীদের দমন শুরু

হ'ল তা নয়, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ জননেতারাও গ্রেপ্তার হ'লেন। পুলিশ কলকাতায় দু'টি বোমার কারখানা আবিষ্কার করল। ১৯২৬ সালে বিশিষ্ট পুলিশ কর্মচারী রায়বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিপ্লবীদের হাতে নিহত হ'লেন। এছাড়া আরো অনেক পুলিশ কর্মচারী বিপ্লবীদের হাতে নিহত বা আহত হলেন। বৈপ্লবিক তৎপরতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে ১৯২৭ সালে কলকাতায় অনুশীলন ও যুগান্তর দলদু'টি একসাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিল এবং সশস্ত্র বিপ্লবের পথ গ্রহণ করল।

কিন্তু বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৈপ্লবিক তৎপরতা প্রসারিত হয়। বিশেষত উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব বিপ্লবী প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ১৯২৩ সালে Hindustan Republican Association নামে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল —— সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই সমিতির সদস্যরা বৈপ্লবিক আদর্শ ও সাম্যবাদী চিন্তাধারার মাধ্যমে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে সংগঠিত করার পক্ষপাতী ছিলেন।

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে Hindustan Socialist Republican Association নামে একটি নূতন বিপ্লবী সমিতি গঠিত হয়। সমিতির প্রধান লক্ষ —— ভারতে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য স্থাপন এবং সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে বিদেশী শোষণের পূর্ণ অবসান ঘটানো। কর্মসূচী রূপায়নের জন্য গুপ্তহত্যা ও সশস্ত্র সংগ্রামের পদ্ধতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন বয়কটকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী জনমত সোচ্চার হ'য়ে ওঠে। ১৯২৮ সালের ২০শে অক্টোবর সাইমন কমিশন লাহোরে উপস্থিত হ'লে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। এই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন জনপ্রিয় নেতা লালা লাজপত রায়। পুলিশের লাঠির

আঘাতে লাজপত রায় গুরুতর আহত হ'য়ে মারা যান। লাজপত রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সাণ্ডার্স নামক জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীকে বিপ্লবীরা হত্যা করে।

(২)

উপরে যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট অঙ্কিত হ'ল তারই পরিপ্রেক্ষিতে 'শ্মশানের পথে' গল্পটি লেখা হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ-জমিদার-মহাজন-মধ্যস্বত্বভোগীদের সম্মিলিত আক্রমণে বিপর্যস্ত গ্রাম বাংলার পটভূমিতে গল্পটি গড়ে উঠেছে। জমিদার বংশের সন্তান হিসেবে প্রজার উপর আর্থিক ও অন্যান্য কারণে অমানুষিক অত্যাচারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব তারাশংকরের ছিল না। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রেরণায় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে জনসেবার জন্য গ্রামে ভ্রমণকালে দরিদ্র কৃষক সমাজের দুর্গতির বাস্তব রূপ তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল। বৈদেশিক রাজশক্তি ও জমিদার-মহাজন-মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ ও অত্যাচারে পল্লীজীবন যে বিপর্যস্ত হ'তে বসেছে, তার শ্মশান-যাত্রা যে আসন্ন, আপন ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতায় লেখক তা উপলব্ধি করেছেন —

"পল্লীজীবন, পল্লীসমাজ জীর্ণ হ'য়েছে, ভেঙে পড়তে গিয়ে কোন ক্রমে সেই ভাঙা কাঠে বাঁশে ঠেকা খেয়ে ঝুঁকে পড়ে টিকে রয়েছে কায়ক্লেশে —— শ্মশান আসছে এগিয়ে। জমিদার মহাজন কাবুলিওয়ালার শোষণ তাড়না; ম্যালেরিয়ার আক্রমণ; ঈশ্বরের নীরবতা —— গ্রামের চাষীকে নিয়ে চলেছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে। এ অভিজ্ঞতা আমার প্রত্যক্ষ।"[৬]

ছোট জমিদার বংশে লেখকের জন্ম। আবার মার কাছে পেয়েছিলেন 'এক বিচিত্র ন্যায়-অন্যায় বোধের ধারণা'। এ-বিষয়ে লেখক বলেছেন —"প্রজার

কাছে খাজনা আদায় করেছি — সুদ নিয়েছি খাজনা বৃদ্ধি করেছি ; কাছারিতে মহাজনকে বসিয়ে রেখেছি , যে প্রজা খাজনা দিতে পারছে না তাকে মহাজনের কাছে ধার নিতে বাধ্য করেছি — সেই টাকা খাজনা হিসেবে জমা করেছি । আমার তখন বয়স অল্প , আমাদের প্রবীণ নায়েব করেছেন —— আমি অবাক হয়ে দেখেছি । শরিকী জমিদারের কাছারিতে গিয়েছি —— সেখানেও দেখেছি তাই । আরও বেশী দেখেছি —— দেখেছি সেখানে তাঁরা নিজেরাই মহাজনি করেন , ধান টাকা সুদে ধার দেন ।"[৭]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমি-ব্যবস্থায় কৃষকের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল , জমি পরিণত হয়েছিল পণ্যে । পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে ছোট ছোট নূতন জমিদার । এ-প্রসঙ্গে তারাশংকর লিখেছেন —

"বীরভূমে জমিদারের একটা বৈশিষ্ট্য হল জমিদারীর আয়তন ও আয়ের ক্ষুদ্রতা এবং তাঁদের সংখ্যার বাহুল্য । দশ হাজার টাকা আয় যাঁদের , তাঁরা রাজাতুল্য ব্যক্তি । আমাদের গ্রামের জমিদারের আয় পাঁচ থেকে সাত - আট হাজার । কিন্তু তাতেই তাঁদের প্রবল পরাক্রম । সমারোহ প্রচুর । এছাড়া চাষের জমির সঙ্গে পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো — হাজার টাকা বাৎসরিক আয়ের জমিদার অনেক , হাতেপায়ের আঙুলে গণা যায় না ।"[৮]

জমিদারতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতায় পত্তনিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর প্রাধান্য বাড়ে । একদা যে কৃষক জমির মালিক ছিল সে হ'য়ে পড়ল ভূমিহীন । ফলে জীবিকার প্রয়োজনে কৃষক ক্রমে ভাড়াটে কৃষি মজুর ও ভাগচাষীতে পরিণত হয়েছে । এরই সাথে যুক্ত হয়েছে সার্বিক আর্থিক বঞ্চনা ।

তারাশংকর তাঁর প্রথম দিকের বিশিষ্ট গল্প —— 'শ্মশানের পথে'-তে তাঁর পরবর্তীকালের লেখার বিষয় খুঁজে পেয়েছিলেন । তা হ'ল —— গ্রামীণ সমাজ ও

তার ভাঙন। শ্রাবণ, ১৩৪৪ থেকে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ পর্যন্ত 'প্রবাসী'-তে সেকালের যে ছত্রিশটি বইয়ের সমালোচনা তারাশংকর করেছিলেন তা থেকে গল্প-উপন্যাসে তাঁর অনিষ্ট কি ছিল তা বোঝা যায়। বাংলা দেশের নিপীড়িত প্রাণের সন্ধানে' তাঁর দৃষ্টি 'নদীতীরের কৃষিক্ষেত্রের দিকে' নিবদ্ধ ছিল আর এটাই যে তাঁর সুক্ষেত্র সেকথা রবীন্দ্রনাথ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন তাঁকে —"তুমি গাঁয়ের কথা লিখেছ।.... তোমার মতো গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়ি নি।"[৯]

১৯২৮ সালে 'কালিকলম' (আশ্বিন, ১৩৩৫)-এ প্রকাশিত 'শ্মশানের পথে'-এ তারাশংকর গ্রামীণ সমাজের ভাঙনকে সাহিত্য-রূপ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন।

জমিদারতন্ত্রের ঐশ্বর্য ও মহিমার প্রতি তারাশংকরের পিছুটান এবং খানিকটা স্বাভাবিক মমত্ববোধ ছিল। কিন্তু প্রজার প্রতি ভূস্বামীদের অমানুষিক নির্মমতা তাঁর চিত্তকে বিষাদমগ্ন করেছে। তাঁর আত্মকথায় এই বিষাদের সুর ধ্বনিত। জমিদার, মহাজন, কাবুলিওয়ালা ও মধ্যসত্ত্বভোগীদের আর্থনৈতিক শোষণ ও নিপীড়ন 'শ্মশানের পথে' গল্পটির পটভূমি রচনা করেছে। গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে একটি চাষী পরিবার — গোষ্ঠ ও দামিনী — স্বামী ও স্ত্রী — যার দুই সদস্য। বিচিত্র শোষণে এ পরিবারটি কিভাবে জমি থেকে উৎখাত হ'ল গল্পটিতে তা' দেখানো হয়েছে। গল্পটির কাল-সীমা তিন দিনের। গল্পের শেষে দেখি —গ্রামে এল বন্যা। বন্যার তোড়ে শ্মশান গ্রামে এসে ঢুকল।

গল্পের শুরুতেই একটি মৃতপ্রায় জীর্ণ গ্রামের বর্ণনা পাই, যার একপ্রান্তে শ্মশান। শ্মশান যেন এগিয়ে এসে গ্রামটিকে গ্রাস করছে। লেখকের বর্ণনায় আছে— "গ্রামের প্রান্তে শ্মশানটা, যেন জীবনের রাজ্যে মরণের অভিযান; পল্লীটার দ্বারপ্রান্ত অবরোধ করিয়া মরণের কটক থানা বসাইয়াছে।"[১০] নানা ধরনের শোষণে, প্রাকৃতিক

দুর্যোগে গ্রামের ধ্বংস হ'য়ে যাওয়া তারাশংকরের প্রথম দিকের লেখার মূল থাম। 'শ্মশানের পথে' গল্পে এই থীম প্রযুক্ত হওয়ায় আগ্রাসী শ্মশান এখানে প্রতীকা - তাৎপর্য লাভ করেছে।

১৯১৮ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত সেবাব্রতী হিসেবে ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামজীবন সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তা-ই ব্যবহৃত হয়েছে 'শ্মশানের পথে' গল্পে। ১৯২৩-২৫ সালে বীরভূমের ব্যাপক অঞ্চলে যে মহামারী হয়েছিল তাতে সেবামূলক কাজ করতে গিয়ে গ্রামের ধ্বংসের যে চেহারা তারাশংকর দেখেছিলেন তাকেই আগ্রাসী শ্মশানের প্রতীকে বেঁধেছেন। গল্পটিতে যে গ্রামের কথা আছে সেটি সেকালের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রাম।

গল্পের প্রথমে কাবুলিওয়ালার অত্যাচারের ছবি অঙ্কিত। সে গোষ্ঠকে টাকা ধার দিয়েছে। এখন সুদ চায়। গোষ্ঠর সুদ দেওয়ার বা ধার শোধের সামর্থ্য নেই। সে পালিয়ে বেড়ায়। এদিকে তার ছেলে অসুস্থ। স্ত্রী দামিনী কবিরাজ ডাকার জন্য প্রতিবেশী সুবল দাসের কাছে হাতের পৈঁছা জোড়া বাঁধা রেখে টাকা ধার করে। এইখানে গল্পের মধ্যে একটু জটিলতা আনা হয়েছে।

আট বছরের দামিনী যখন গোষ্ঠের ঘরে বধূবেশে এসেছিল তখন প্রতিবেশী সুবল ছিল তার খেলার সাথী। 'কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে সম্মোহনের আবেশময় রাজ্যে উভয়ে প্রবেশ করিতেই দুজনের এই প্রীতি কেমন টুটিয়া গেল; সেই মুগ্ধদৃষ্টি দেখিয়া দামিনী বুঝিল এ - আবেশ —— মোহের আবেশ।'[১১] তখন ধীরে ধীরে দামিনী সুবলের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। সুবল কিন্তু ছুতোনাতায় দামিনীর ঘনিষ্ঠতা চায়। দামিনীকে অভাবের সময় সাহায্য ক'রে সুবল তাকে কাছে পেতে চায়।

এইভাবে গল্পে জমিদার, মহাজন, কাবুলিওয়ালার অত্যাচারের পাশাপাশি আরেকটি সংকটও গোষ্ঠ-দামিনীর জীবনে ঘনিয়ে আসে সুবলের দিক থেকে। তারাশংকর গ্রামীণ শোষণের চেহারা দেখাতে গিয়ে মানবিক সম্পর্কের জটিলতাকেও দেখান। ফলে গল্পটির শিল্প-সম্ভাবনা বাড়ে।

সুদখোর মহাজন শ্রেণীর লোভ সেকালের চাষীদের জীবনে কী সংকট ঘনিয়ে তুলেছিল তা বর্তমান গল্পে প্রদর্শিত হয়েছে। তারাশংকর নিজ চোখে মহাজনদের দুরন্ত লোভ দেখেছিলেন। রসিক দত্ত মহাজনকে 'জীয়ন্ত শৃগালে'-র সাথে লেখক তুলনা করেছেন। লজ্জার মাথা খেয়ে সুবলের কাছ থেকে মরণাপন্ন ছেলের চিকিৎসার জন্য যে টাকা দামিনী চেয়ে এনেছিল তা মহাজন সুদ হিসেবে নিয়ে গেল। মহাজনরা জমিদার ও প্রজার মাঝে থেকে জমিদারের সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রজাশোষণ করত।

সুবল একজোড়া শাঁখা লুকিয়ে দামিনীর ঘরে রেখে যায়। দামিনী ভাবে গোষ্ঠ তাকে ভালোবেসে শাঁখাজোড়া লুকিয়ে রেখে গেছে। এ নিয়ে গোষ্ঠের সঙ্গে দামিনীর প্রচন্ড ভুল-বোঝাবুঝি হয়। গল্পে একজোড়া শাঁখাকে ব্যবহার করে সুবল-দামিনী-গোষ্ঠ —— চরিত্রত্রয়ীর সম্পর্কের জটিলতাকে দেখানো হয়েছে ও খানিকটা নাট্যরসও সৃষ্টি করা হয়েছে।

এরপর গোষ্ঠর একমাত্র ছেলের মৃত্যু এবং তাকে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার বর্ণনা। কারণ 'বানের ঠেলে শ্মশানটা এগিয়ে এসেছে।'[১২] এখানেও আগ্রাসী শ্মশান ধ্বংসের প্রতীক।

পরদিন সকালেই জমিদারের পেয়াদা খাজনা আদায়ের জন্যে হাজির। পুত্রের মৃত্যুর জন্যে শোক করার অবকাশ চাষীর নেই। "খাজনা, চাঁদা, সুদ, চেকের দাম, নজরানা, তহুরি, আমলা-খরচ, প্যায়দার রোজ —— 'বাবে'র আর অন্ত নাই, সে 'বাবে'-র এক কানাকড়িও মাপ নাই; সব

সেখানে লোলুপ গ্রাসে হাঁ করিয়া বসিয়া আছে।'[১৩] তাই জমিদারের পেয়াদার হাত থেকে বাঁচার জন্য গোষ্ঠ পালায়, দামিনী পালাতে পারে না। দামিনীকে বাঁচায় সুবল। গোষ্ঠর দেনা সুবল শোধ করে। সুবলের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে দামিনী লজ্জায় সংকুচিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুবল দামিনীকে দখল করতে চায়।—— "নীরবে দুইখানা হাত দামিনীর দেহ জড়াইয়া ধরিল। সর্বশরীরে দামিনী যেন সরীসৃপের স্পর্শ অনুভব করিল। ঘৃণায়, ভয়ে দেহখানা তাহার আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিল।"[১৪] গল্পের শেষে দেখি গোষ্ঠ বলে —— 'বানের আগে আগে শ্মশান ভেসে গাঁয়ে ঢুকচে।'[১৫] দামিনী আশ্বস্ত হয়ে বলে—'আর কত দেরী'। এইভাবে আগ্রাসী শ্মশানের ছবিতে গল্পটি গ্রামীণ কৃষকসমাজের ধ্বংস সংকেতিত করে শেষ হয়।

জমিদারী চালাতে গিয়ে এবং কংগ্রেসের কাজ করতে গিয়ে গ্রামীণ কৃষকসমাজ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা তারাশংকর অর্জন করেছিলেন তাকেই প্রয়োগ করেছেন 'শ্মশানের পথে' গল্পে। পরে কলিয়ারিতে কাজ করার সূত্রে শ্রমিক জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন। এ-বিষয়ে তারাশংকর লিখেছেন—

"শ্বশুরকুল আমার কলিয়ারির মালিক। তাঁরা পড়ো জমিদারঘরের অর্ধ-শিক্ষিত জামাইটিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন যথেষ্ট। কখনও কলকাতার আপিসে কখনও কয়লা-কুঠিতে পাঠিয়ে কাজের লোক করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রতিবারই মাস ছয়েকের বেশী লেগে থাকতে পারি নি। পালিয়ে এসেছি। কাজের লোক হই নি—তবে সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের পাথেয় হয়েছে।"[১৬]

কৃষকজীবনের অভিজ্ঞতা ও শ্রমিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে জুড়ে তারাশংকর লিখলেন—'চৈতালী-ঘূর্ণি', তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। (তাঁর প্রথম লেখা উপন্যাস 'রাইকমল')।

'চৈতালী-ঘূর্ণি'-র রচনাকাল নিয়ে লেখক নিজে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। 'আমার সাহিত্য-জীবন' (১ম খণ্ড)-এ লেখক লিখেছেন —— "জেলখানায় বসে এই ভাবনাকে ('শ্মশানের পথে' গল্পকে) প্রসারিত করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ..... জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম। 'উপাসনা'-র সম্পাদক কবি সাবিত্রীপ্রসন্নের সঙ্গে আলাপ আগেই হয়েছিল, এবার তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন। তাঁর 'উপাসনা' তেই 'চৈতালী-ঘূর্ণি' বের হল।"[১৫] তারাশংকর জেলে ছিলেন ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। লেখকের দেওয়া তথ্য অনুসারে 'উপাসনা'-য় 'চৈতালী-ঘূর্ণি'র প্রকাশ তাহলে ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসের পরে কোনো সময়ে হওয়া উচিত। কিন্তু 'চৈতালী-ঘূর্ণি' ধারাবাহিকভাবে 'উপাসনা'-য় বেরিয়েছিল ১৯২৯-এর নভেম্বর থেকে ১৯৩০-এর এপ্রিলের মধ্যে। সুতরাং উপন্যাসটি জেলে বসে লেখা হয়নি, লেখা হয়েছে জেলে যাবার বেশ ক'মাস আগে। হয়তো জেলে বসে অথবা জেল থেকে বেরিয়ে লেখক পত্রিকায় মুদ্রিত পাঠের কিছুটা পরিমার্জনা করেছিলেন।

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে 'শ্মশানের পথে' বেরুল 'কালি-কলমে' আর ১৯২৯ সালের নভেম্বরে 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-র প্রথম কিস্তি বেরুল 'উপাসনা'-য়। তাহলে উপন্যাসে যে নূতন সমাজবোধ ফুটে উঠল তা লেখক অর্জন করেছিলেন এই মধ্যবর্তী সময়বৃত্তে। অথচ লেখকের আত্মকথায় তার বিবরণ নেই।

১৯২৮ সাল ধরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং দেশব্যাপী বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক ধর্মঘট সংঘটিত হয়। এ-সময়ের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা হ'ল —— বোম্বাই বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের ব্যাপক ধর্মঘট। সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি সত্ত্বেও 'গিরনি কামগার ইউনিয়ন' নামক কমিউনিস্ট শ্রমিক সমিতির পরিচালনায় দীর্ঘ ছয়মাস ধরে বোম্বাইয়ের দেড় লক্ষ সূতাকল শ্রমিক ঐতিহাসিক সংগ্রামে নামেন। বস্তুত, এ-সময় শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা খুবই সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। ভারত সরকার জঙ্গী শ্রমিক

আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আদর্শের প্রসারে সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের ৩১ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁদের অভিযুক্ত করা হয়। সরকারী দমননীতির ফলে ভারতের শ্রমিক ও সাম্যবাদী আন্দোলন দুর্বল হ'য়ে পড়ে। ভারতীয় শ্রমিক সংগঠনেও বিভেদ দেখা দিল।

তারাশংকর যখন 'শ্মশানের পথে' গল্পটি লিখছিলেন এবং যখন তা' প্রকাশিত হ'ল তখন জাতীয় জীবনে যে হতাশা দেখা দিয়েছিল (যার ছাপ পড়েছে গল্পটিতে, বিশেষত অগ্রসরী শ্মশানের প্রতীকে) 'চৈতালী-ঘূর্ণি' উপন্যাসটি লেখার সমকালে এবং 'উপাসনা'-য় ধারাবাহিক প্রকাশের সমকালে জাতীয় জীবনে আন্দোলনের জোয়ার আসায় —(১৯৩০ — ৩৪ যার চূড়ান্ত পর্যায়) সেই হতাশা কেটে গিয়েছে।

বাংলায় আক্রম খাঁ, আব্দুর রহিম, ফজলুল হক প্রমুখ মুসলমান নেতারা ১৯২১-এ প্রজা পার্টি গঠন ক'রে প্রজা স্বার্থ সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করেন এবং পূর্ববঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষিজীবী জনগণকে জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। এর আগে ১৯২৮-এ 'প্রজাস্বত্ব আইনে'র সংশোধন উপলক্ষে বাংলাদেশের চাষীদের মধ্যে আলোড়ন দেখা দেয়। ১৯২৯-এ বিহারে সহজানন্দের নেতৃত্বে কৃষক-সভা স্থাপিত হয়।

'চৈতালী-ঘূর্ণি' লেখা ও প্রকাশের সমকালের সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা — শ্রমিক আন্দোলনের অভ্যুদয়। ১৯২৮ সালে ভারতের নানা অঞ্চলে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। সরকারি হিসেবে ৩১৬৪৭০০০ শ্রম-দিবস নষ্ট হয় ঐ বছর। শুধু বাংলাদেশেই ঐ বছর ১২৬৫৭৫ জন শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। ১৯২৯-এর শেষদিকে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়, তার ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবু ১৯২৮-২৯-এ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নবজাগরণ দেখা দেয় এবং জাতীয় জীবনেও উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়, বিশেষত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে।

এ-সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে তারাশংকর লিখেছেন ——

"১৯২১ সালে তখন দেশের রাজনৈতিক জীবনের ধূমায়মান অবস্থা। মনে হচ্ছে জ্বলবে, আবার জ্বলবে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহ্নিমান হয়ে উঠবে।"[১৮]

তাই বলা যায় — "তারাশংকরের প্রথম উপন্যাস জাতীয় জীবনে এই ঘূর্ণিঝড়ের ক্রমবর্ধমান গতিবেগের দোলায় লেখা।"[১৯] ১৯৩০ সালে যখন 'উপাসনা' পত্রিকায় 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-র শেষাংশ বেরোচ্ছে, তখনকার উল্লেখ্য ঘটনা —— গান্ধিজির ডান্ডি অভিযান, মেদিনীপুরের লবণ-সত্যাগ্রহ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শোষণের যে ভয়াবহ রূপ বীরভূমের গ্রামে দেখেছিলেন তারাশংকর তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন 'শ্মশানের পথে' গল্পে এবং পরে 'চৈতালী-ঘূর্ণি' উপন্যাসের প্রথম পর্বে। উপন্যাসের পরের অংশে কৃষক হয়েছে শ্রমিক, সহিংস প্রতিবাদী শ্রমিক। শ্রমিকের এই চেহারা কলিয়ারিতে কাজের সময় তারাশংকর অবশ্যই দেখেন নি। কারণ ১৯১৯ সালে মাত্র ৬ মাস তিনি কলিয়ারিতে কাজ করেছেন। এ-সময় এদেশের শ্রমিকদের জীবনে এমন কোনো কারণ ঘটেনি যা লেখককে গোষ্ঠের পরবর্তী জীবন-রূপায়ণে প্রেরণা জোগাতে পারে। তাই ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সময়সীমায় এদেশে যে শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের ঘটনাগুলি ঘটেছিল সেগুলিই লেখককে গোষ্ঠের শ্রমিকজীবনের কাহিনী লিখতে প্রণোদিত করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল রুশ বিপ্লবের পরোক্ষ প্রভাব। এ-বিষয়ে লেখক লিখেছেন, —— "হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। ..... উনিশশো ষোল সতের সাল থেকে উনিশশো ত্রিশ একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষের মধ্যে ঘুরে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, সেদিন আসতে আর দেরী হবে না। রুশ বিপ্লব সেই দিনের উষাকাল তাতে

সন্দেহ নাই । বাতাসটা উঠেছিল সেইখানেই প্রথম , সেখান থেকে উঠে এখানকার গুমোটের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে ।"[২০] বিষয়ের দিক দিয়ে ইগ্নাজিও সেলোনীর 'ফন্তামারা' ও ম্যাক্সীম গোর্কীর 'মা'-র সাথে তারাশংকরের 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-র আংশিক সাদৃশ্য দেখা যায় । 'উপাসনা'-তেও 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-র দ্বিতীয় কিস্তির সঙ্গে স্থান পায় গোর্কির বিষয়ে প্রবন্ধ ও ছবি । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে , ১৯৩০ সালে বাংলায় প্রথম শ্রমিক-বিষয়ক পত্রিকা 'সংহতি' প্রকাশিত হয় । এই পত্রিকায় তারাশংকরের 'চৈতালী-ঘূর্ণি' প্রকাশের আগেই নারায়ণ ভট্টাচার্যের 'দিনমজুর' গল্প, শৈলজানন্দর 'বাঙালী ভাইয়া' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাস প্রকাশিত হয় । সে হিসেবে তারাশংকর এঁদের উত্তরসূরী । অবশ্য 'চৈতালী-ঘূর্ণি' একান্তভাবে শ্রমিকজীবনের কাহিনী নয় । বাংলাদেশের প্রায় সব শ্রমিকই আসলে কৃষিক্ষেত্র থেকে উন্মূলিত ভূমিহীন নিঃসম্বল কৃষক । তারাশংকর সেই রূপান্তরের একটি সংশ্লিষ্ট পরিচয় দিয়েছেন এই উপন্যাসে ।

'উপাসনা'য় 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-র শেষ কিস্তি বেরোয় এপ্রিল , ১৯৩০-এ । গ্রন্থাকারে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালের শেষদিকে । তারাশংকর জেলে ছিলেন ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত । হয়তো জেলে ব'সে অথবা জেল থেকে বেরিয়ে 'উপাসনা'য় ধারাবাহিক মুদ্রিত পাঠের পরিমার্জনা করেছিলেন । ফলে পত্রিকায় মুদ্রিত পাঠের সাথে গ্রন্থের পাঠের খানিকটা পার্থক্য চোখে পড়ে । যেমন , পত্রিকায় মুদ্রিত অংশে সুরেন ও শিবকালী —— এই দুই শ্রমিক নেতার উল্লেখ নেই । অথচ উপন্যাসে এরা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে ।

(তিন)

"শ্মশানের পথে' গল্পের সঙ্গে 'চৈতালী-ঘূর্ণি' উপন্যাসের কাহিনী-গত পার্থক্য "———

জমিদার-মহাজনের শোষণে, অত্যাচারে রাঢ় অঞ্চলের সদ্‌গোপ চাষী গোষ্ঠ জমি থেকে উৎখাত হল শেষ অবধি। গ্রামে এলো বন্যা, নদী-চরের শ্মশানও বানের চেলায় এগিয়ে এসে, গ্রামের মধ্যে ঢুকল। এটুকুই 'চৈতালী-ঘূর্ণি' উপন্যাসের প্রথম পর্ব। 'কালি-কলম'-এ প্রকাশিত 'শ্মশানের পথে' গল্পে এটুকুই ছিল কাহিনী।

কিন্তু গল্পের সঙ্গে উপন্যাসের উল্লিখিত প্রথম অংশেরও কিছু অমিল লক্ষ করা যায়।

গল্পের শুরুতে আগ্রাসী শ্মশানের যে বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, উপন্যাসের শুরুতে স্বভাবতই সে-বর্ণনা ঈষৎ বিস্তারিত। শ্মশানের প্রতীকের প্রতিস্পর্ধী প্রতীক হিসেবে যে চৈতালী-ঘূর্ণি উপন্যাসের পরবর্তী অংশে বারবার ঘুরে আসে ও বিশেষ মর্যাদা পায়, তার আভাস পাই উপন্যাসের সূচনাতেই ----

"সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ঝ'ড়ো হাওয়ার মত। কিন্তু সে চৈত্র-প্রান্তরের ঘূর্ণির মতই ক্ষীণ আর ক্ষণস্থায়ী; উঠিয়াই মিলাইয়া যায়।"[২১]

কাবুলিওয়ালার ভয়ে গোষ্ঠর লুকোবার ঘটনা গল্প-উপন্যাস ---- দুটোতেই আছে। (১৯২৬ সালে বীরভূমে কাবুলিওয়ালার সুদের হার ছিল ১৫০% — ১৭৫%। গরিব চাষী ও ভূমিহীন চাষী ছিল ওদের প্রধান খাতক।) কিন্তু অসুস্থ ছেলের চিৎকারে বিরক্ত হ'য়ে প্রতিকারহীন গোষ্ঠ উপন্যাসে মাঠের পথ ধরে। মাঠে এসে দেখে সবুজ ধানে মাঠ ভরে রয়েছে। পথে ভোলা ময়রার সাথে গোষ্ঠর আলাপে অতীতের সুচ্ছলতার সাথে বর্তমানের রিক্ততার তুলনা চলে। আখ খেতে জমিদারের চাপরাসীকে আখ চুরি ক'রে খেতে দেখে গোষ্ঠর 'ধন ধান জল কোথা' প্রশ্নের উত্তরে ভোলা বলে — 'ওই দশজনে লুটেই খেলে।'

এই অংশটি গল্পে ছিল না।

বর্তমানের রিক্ততার তুলনায় অতীতের সুখস্মৃতি দামিনীকেও আপ্লুত করে। দাম্পত্যজীবনের রমণীয় স্মৃতি উপন্যাসে কিছু বিস্তৃত রূপ পায়।

অসুস্থ ছেলের চিকিৎসার জন্য কবিরাজ ডাকতে সুবলের কাছ থেকে পৈঁছার বদলে টাকা নেওয়ার প্রসঙ্গ গল্প-উপন্যাস — দুটোতেই আছে। কিন্তু বিরক্ত হ'য়ে গোষ্ঠের আবার মাঠে যাওয়া, সতীশ সরকারের সাথে দেখা হওয়া ও তার কাছ থেকে মহাজন দত্ত যে তার জমি দখলের জন্য আদালতের ডিক্রী পেয়েছে তা জানা এবং গোষ্ঠর হতাশায় ভেঙে পড়ার কথা গল্পে নেই। উপন্যাসের এই অংশে লেখক উপন্যাসের ঘটনাবলীর কাল সম্পর্কে কিছুটা অবহিত করেন।

"আজ মাস্টার পড়িতেছিল অসহযোগ আন্দোলন, বক্তৃতার সুরে সে পড়িতেছিল, মহাত্মার বাণী, স্বরাজ আসিবে, স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার, শুধু বাণী পালন কর। .... স্বরাজ হলেই আর চাই কি!"

গোষ্ঠ বলে — "জমিদার - মহাজন উঠবে বলতে পার?"

যোগী বলে — "স্বরাজ - ফরাজ বুঝি না আমরা, যমের হাত হ'তে বাঁচি কিসে তাই মহাত্মা বলুক।"[২২]

গল্পে এভাবে কালকে চিহ্নিত করা হয়নি। অথবা গান্ধীজীর কাঙ্ক্ষিত স্বরাজ শোষণের হাত থেকে গ্রামের কৃষককে বাঁচাবে কিনা —— এ - ধরনের প্রশ্ন তোলা হয়নি। যদিও ভগবান ও ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে দু'টি ক্ষেত্রেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

সুবলের গোপনে রেখে-যাওয়া শাঁখা-জোড়া নিয়ে যে নাটকীয় ঘটনা ঘটে তা' গল্প-উপন্যাস উভয়ত এক। গোষ্ঠের ছেলের মৃত্যু, সৎকারের বদলে জলে ভাসিয়ে দেওয়াও উভয়ত এক। উপন্যাসে শুধু অতিরিক্ত সংযোজন —— গোষ্ঠর

কিছু উক্তি (যেমন —— "শ্মশান তো বুকে বুকে, ঘরে ঘরে, কিন্তু যা আসে কই, নাচে কই ? ফাঁকি, ও সব ফাঁকি, ও সব মানুষের মন-গড়া কথা।)"[২৩] ও লেখকের ব্যাখ্যা।

এরপর উপন্যাসে মহাজন রসিক দত্ত আদালতের ডিক্রী পেয়ে গোষ্ঠের জমি দখল করতে যায়, গোষ্ঠ রাম ভল্লার সাহায্যে মহাজন ও তার সঙ্গীদের তাড়িয়ে দেয়। রাম তাকে সাবধান করে দেয় ——'জমি তো তোর যাবেই।' কারণ মহাজনের পেছনে আছে জমিদার। জমি রক্ষার তথা জমিদার-মহাজনের লোভ প্রতিহত করার যে শক্তি ক্ষণকালের জন্য গোষ্ঠর মধ্যে জেগেছিল তা মিলিয়ে যায় —— "চৈত্রের ঘূর্ণি ক্ষীণজীবী যে; আকাশ বাতাস ধরণী সব আগুন না হইলে বড় পরমায়ু পাইবে কোথা ?"[২৪] এখানে চৈতালী-ঘূর্ণির প্রতীক উপন্যাসে প্রযুক্ত হ'ল। গল্পে এ-সব ঘটনা, মন্তব্য বা প্রতীক অনুপস্থিত। 'শ্মশানের পথে' গল্পে ছিল সার্বিক হতাশা, 'চৈতালী-ঘূর্ণি' উপন্যাসে নৈরাশ্য থেকে আশার সম্ভাবনায় উত্তরণ চোখে পড়ে।

১৯১৪ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে বীরভূমের গ্রামে মহাজনের ভূমিকা বিষয়ে তারাশংকর লিখেছেন —— "১৯৩০ সাল নাগাদ বাংলার চাষীর যা সম্পত্তি অর্থাৎ ভিটে মাটি জমি তার থেকে ঋণের পরিমাণ বেশি। ১৯১৪ থেকে ৩০ সাল পর্যন্ত চাষীর জমি জেরাত ভিটে —— এককথায় নখ থেকে চুল পর্যন্ত মহাজনের বঁড়শিতে গাঁথা হ'য়ে গেছে।"[২৫] সমাজে মহাজনের ভূমিকা ছিল অশুভ। চাষীর জমি মহাজনের কবলে যাওয়া উৎপাদনের পরিপন্থী, গ্রামীণ অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর। মহাজনের শোষণের বিবরণ গল্পে সংকেতিত, উপন্যাসে কিছুটা বিস্তৃতভাবে বিবৃত।

জমিদারের পেয়াদার টাকা আদায় করতে আসা, দামিনীর সুবলের কাছে আশ্রয় নেওয়া, সুবলের গোষ্ঠের হ'য়ে টাকা শোধ করার ঘটনা —— গল্প ও উপন্যাস, উভয়ত এক। টাকার বদলে সুবলের দামিনীকে গ্রাস করার কথাও এক।

দামিনীর আত্মগ্লানিতে ও অগ্রাসী শ্মশানের ক্রমশ গ্রামকে গ্রাস করার ইংগীতে গল্পের সমাপ্তি। কিন্তু গোষ্ঠ যে শেষ পর্যন্ত দামিনীর হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় তার জন্যে একটি হত্যার ঘটনা উপন্যাসে আনা হয়েছে। গোষ্ঠ চরম নির্যাতিত ও শোষিত হ'য়েও হয়ত গ্রামে মাটি কামড়ে পড়ে থাকত। পরবর্তীকালে শহরে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে গোষ্ঠ ও দামিনী ফেলে-আসা গ্রামের স্মৃতিচারণ করেছে—— ("আজ মনে হয়, শত দীনতা, শত নির্যাতনের মধ্যে সে ছোট গ্রামখানি, সে ছিল ভাল।")। জমিদারের পেয়াদাকে খুন ক'রে গোষ্ঠ বাধ্য হ'য়েছে গ্রাম ছাড়তে।

গ্রাম ছেড়ে গোষ্ঠ যেখানে আসে সেটি একটি অর্ধ-শহর। সেখানে ধান-কলে সে মজুরের কাজ নিল। ভূমি থেকে উৎখাত হওয়া চাষী জীবিকার তাগিদে কল-কারখানায় কাজ নিচ্ছে; কৃষক পরিণত হচ্ছে শ্রমিকে, শিল্প-বিপ্লবের পটভূমিকায় এ বাস্তব সত্য। কিন্তু এদেশে শিল্প-বিপ্লব আজও ঘটেনি। শিল্প-বিপ্লব না ঘটায়, কৃষিতে শোষণ ও উচ্ছেদের মাত্রা বাড়লেও বাঙালি চাষীর কল-কারখানায় কাজ জোটানোর সুযোগ আজও খুবই কম। ১৯৫১ সালেও বীরভূমের ভূমিহীন চাষীকে জীবিকার সন্ধানে জমি আঁকড়েই থাকতে হয়েছে। ১৯২৮-৩১ কালপর্বে গোষ্ঠের মতো দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। ভূমিহীন চাষীর কলের মজুরে রূপান্তর —— সমাজের ঐতিহাসিক গতির চিহ্ন। তারাশংকর সমাজের রূপান্তরের এই প্রক্রিয়াকে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু 'চৈতালী-ঘূর্ণি' লেখার সমকালীন সামাজিক পরিমণ্ডলে এটি সাধারণ ঘটনা ছিল না। যদিও গ্রামীণ অর্থনীতির বাস্তব, তার সামগ্রিক — জটিল রূপ 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-তে নিপুণভাবে প্রতিফলিত। তাছাড়া, গোষ্ঠ কাজ করেছে ধান-কলে। উপন্যাস-রচনার সমকালে বীরভূম বা সংলগ্ন অঞ্চলে তেমন বড় কল-কারখানা স্থাপিত হয়নি। আজও এ অবস্থার কোনো ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে নি।

শহরে এসে গোষ্ঠ দেখে 'সবারই মাঝে একটা বহিঃ সৌন্দর্যের আস্ফালন।' তারাশংকর মার্কসবাদী না হ'য়েও তাঁর মানবতাবাদ দিয়ে

সমাজে শ্রেণীবৈষম্য বিষয়ে অবহিত ছিলেন —— । যেমন , ——

১। "মালের গাড়ি সব বোঝাই হয় , ধানে চালে আহারের সামগ্রীতে বোঝাই করে , আহার যাহাদের জোটে না তাহারাই ।"[২৬]

২। "মাটিতে মাথা বুঝি ঠেকিয়া যায় , কাঁধ বাঁকাইয়া গরুর গাড়ি হইতে দুইমণী বস্তাগুলো গাড়িতে বোঝাই করে অর্ধাহারী মজুরের দল ।"[২৭]

৩। "আট আনা , দশ আনা মজুরীতে ইহাদের সাত-ঘন্টার আয়ু বিকায় ।"[২৮]

গোষ্ঠ আশ্রয় পায় শ্রমিক বস্তিতে । তারাশংকরের বর্ণনায় ——

"মজুরগুলার বাস ওই উত্তাপ , ওই লৌহ-বন্ধনের মাঝে , লাইনের ধারেই ছোট ছোট পায়রা-খুপীর মত ঘর —— ওই মজুরের বস্তি , সমাজের আঁস্তাকুড় , অর্থশালীর ডাস্টবিন । পূর্ব দিকে কলের সারি , কালো কালো লম্বা চিমনি , সারাদিন ধোঁয়া উদ্গীরণ করে । উত্তরেও তাই । পশ্চিমে রেলের মালগুদাম । মহাজনকে টাকা আনিয়া দেয় , আর ইহাদের আলো-বাতাসের পথ রোধ করে । রেল-ইঞ্জিনও ধোঁয়া ছাড়ে । ওদিকে দক্ষিণে মদের ভাঁটি , হতভাগ্যদের আয়ু বিক্রয়-করা পয়সাগুলা লুঠ করে ।"[২৯]

সুবল এখানে এসেও জোটে । উপন্যাসের প্রথমাংশের এই চরিত্রটিকে দ্বিতীয়াংশে এনে দামিনীর জীবনে জটিলতা বৃদ্ধি করা হয়েছে । তাছাড়া , উপন্যাসের দু'টো অংশের মাঝে সংযোগ-সাধনে সুবল চরিত্রটি সাহায্য করেছে । গোষ্ঠর গ্রামজীবন ও তার শহরজীবন —— যেন উপন্যাসের মধ্যে দু'টো আলাদা অংশ ।

পুরুষের লোলুপতার শিকার হয় দামিনী। শহর-জীবন তার অসহ্য লাগে। গ্রামের কথা মনে পড়ে। গোষ্ঠ সারাদিন পশুর মতো কলে খাটে। মজুরি যা পায় মদের দোকানে উড়িয়ে আসে। লেখকের বর্ণনায় —— "কাজের শেষে, কয়লায় কালো, আগুনে ঝলসানো দেহ, শুষ্ক বক্ষে মরু-তৃষ্ণা লইয়া সে (গোষ্ঠ) যখন মদের দোকানের পানে ছুটে, তখন সে যেন একটা অর্ধদগ্ধ শব, প্রেতত্ব লইয়া চিতা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে।"[৩০] পশুর মতো খেটে গোষ্ঠ যে মজুরি পায় তাতে আহার জোটে না।

মজুরেরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করার কথা ভাবে। ইশ্‌তেহার পড়ে —— 'শ্রমিক মিলিত হও।' একজন শ্রমিক (টিন্ডাল) আশা করে একদিন শোষণমুক্তি ঘটবে। গোষ্ঠ বিশ্বাস করে না। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের নেতৃত্ব শ্রমিকরা মানতে চায় না। একটি মজুর বলে, "ওরা (বাবুরা) তোদের বুকের উপর ব'সে খাবে, আমি দু-দুবার দেখেছি, আমাদের দিয়ে ধর্মঘট করালে, আর শেষে ওরাই ঘুষ খেয়ে আমাদের সর্বনাশ করালে। .... সাপের দুটো মুখ, যেমন মালিক, তেমনই ওই বাবুরা।"[৩১] অন্য একটি মজুর (টিন্ডাল) প্রতিবাদে বলে —"ওই যে শিবকালী আর সুরেনবাবু, ওই যে খদ্দর পরে, আমাদের পাড়ায় যায় মাঝে মাঝে, ওরা তা নয়। .... মহাত্মাজীর শিষ্য ওরা।"[৩২] শিবকালী কেরানী আর সুরেন টাইপিস্ট। তাই ওদের সম্পর্কে একটি মজুর বলে "ওরা আমাদের দিকে তাকাবে, ওরাও চাকর, আমরাও চাকর।"[৩৩] শিবকালী ও সুরেন মজুরদের সাথে মিশতে চায়। মজুরেরা তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করে না —— 'বিশ্বাসের কান নাই, যাকে বিশ্বাস করবি, সেই ঠকাবে।'[৩৪] লেখকের মন্তব্য : "যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই ক্ষুধাতুরের দল শুধু যে স্বার্থেই বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, তাহা তো নয়; যে বিশ্বাস মানুষের জীবনের একটা পরম আশ্বাস —— শান্তি, সেটুকুতেও দুনিয়া এদের নিঃস্ব করিয়া তুলিয়াছে।"[৩৫] শিবকালী ও সুরেন মজুর — সঙ্ঘ গড়ে তুলতে চায়। তবু মজুরদের সাথে তাদের ব্যবধান থেকেই যায়। মজুররা তাদের বলে —— "আমরা একটা সভা গড়তে চাই। তবে আপনারা শুধু গ'ড়ে দেবেন,

আপনাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না।"[৩৬] ধীরে ধীরে ব্যবধান কমে যায়। গ'ড়ে ওঠে শ্রমিক ইউনিয়ন। জোষ্ঠ হয় তাদের অগ্রণী কর্মী। অত্যাচারী মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হ'য়ে ওঠে কর্মীরা। শ্রমিক - জাগরণের প্রকৃতি সম্পর্কে সুরেন ও শিবকালীর মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা দেয় ——

"সুরেন কহে, ওদের চাই সেলফ - কন্‌শাস্‌নেস্‌; আত্মবিস্মৃতি না টুটলে জাগরণ আসবে না; শিক্ষার ব্যবস্থা না হ'লে তা হবে না, নাইট স্কুল স্টার্ট ক'রে ফেলা যাক।

শিবকালী বলে, এদের জন্যে তার প্রয়োজন নেই, সে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। লঘু মেঘ, সে হ'ল বাষ্প, তার মধ্যে শত সাধনাতেও বজ্রের সন্ধান পাবে না, কিন্তু ঝড় এসে তাদের মিলিত ক'রে দেয়, বর্ষণে বজ্রে ধরণী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে।"[৩৭]

অর্থাৎ শিবকালীর বক্তব্য, শ্রমিকদের মধ্যে চেতনা - সঞ্চারে কোনো প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই, অনুকূল পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করা উচিত। বায়ুমণ্ডলে প্রাকৃতিক ঝড়ের মতো স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে সেই অনুকূল পরিস্থিতি আসবে। শিবকালী শ্রমিক-সংগঠন গড়ে তোলার ব্যর্থ প্রচেষ্টা বিষয়ে সুরেনকে বলেছে ——"কেন মিছে চেষ্টা করছ সুরেন, চাপ না পড়লে ওরা এক হবে না; দেখেছ, আকাশে আকাশে মেঘ আসে, চ'লে যায়, কিন্তু যেদিন বায়ুপ্রবাহ চাপ দেয় সেদিন বিচ্ছিন্ন মেঘমালা জমাট বেঁধে এগিয়ে আসে।"[৩৮]

"স্বতঃস্ফূর্ততার এই নতজানু আরাধনা মার্কস্‌বাদবিরোধী।"[৩৯] চৈতন্যের ভূমিকাকে এখানে ছোট ক'রে দেখা হয়েছে।

শ্রমিক - ঐক্য সহজে আসে না। বাউরীর দল প্রথমে সংগঠন ছাড়ে। মালিক - পক্ষ টাকা দিয়ে ওদের ভাঙিয়ে আনে ('মালিক - পক্ষ আজ মদের জন্য

করকরে দশ টাকা বকশিশ করিয়াছে'।) সুরেন চেষ্টা করে। কিন্তু 'ভাঙা দল আর জোড়া লাগে না।' ফলে 'সুরেনও যাওয়া-আসা ছাড়িল।'

হঠাৎ মালিক-পক্ষ মজুরদের কাজের সময় একঘন্টা বাড়িয়ে দিল। মজুরিও বাড়ল। কিন্তু খুব কম। মজুররা অসন্তুষ্ট হ'ল।

'একটা অসন্তোষ, মনের মধ্যে সহিয়া যাওয়া পুঞ্জীভূত অসন্তোষের উপরে আসিয়া সে অসন্তোষকে নাড়া দিয়া যেন সজীব করিয়া তুলিল।'[৪০] ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করতে মজুররা মদের দোকানে ভিড় করল। সারাদিনের আয় মদেই শেষ হ'ল। দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা শ্রমিকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিল। তারা ধর্মঘট করে মজুরী বৃদ্ধি ও ওভারটাইমের দাবিতে।

এদিকে সুবল ও ছোট মিস্ত্রীর লোলুপতা দামিনীর শান্তি নষ্ট করে। তারই মাঝে বড় মিস্ত্রীর স্নেহ তাকে মুগ্ধ করে।

ধর্মঘট শুরু হয়। শুরু হয় অর্ধাহার, অনাহার। মজুরেরা চাঁদা দেয়। গোষ্ঠ কিছু দিতে পারে না। দামিনী বের করে দেয় তার মৃত পুত্রের জীর্ণ বালা-জোড়া। এখানেও গল্পের সঙ্গে উপন্যাসের এবং উপন্যাসের প্রথমাংশের সাথে দ্বিতীয়াংশের গ্রন্থি বাঁধা হয়েছে।

উনিশ দিন ধর্মঘট চলার পর ধর্মঘট ভাঙার উপক্রম করতে দুই দলে সংঘর্ষ বাধে। আহত গোষ্ঠ হাসপাতালে মারা যায়। 'পাশে শিবকালী দাঁড়াইয়া।' অদূরে তখন রেল লাইনের ধারে কুলীর ছেলেরা ধর্মঘটের খেলা খেলছিল। সেদিকে তাকিয়ে শিবকালী আপন মনে বলে ওঠে — 'চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি, অগ্রদূত কালবৈশাখীর।'[৪১] অর্থাৎ শ্রমিকদের এই আংশিক জাগরণ ভাবী সমাজ-বিপ্লবের পূর্বাভাস। এখানেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

(চার)

জীবন সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী 'চৈতালী-ঘূর্ণি' উপন্যাসের কাঠামো গ'ড়ে তুলেছে তা মার্কসীয় কিনা তা দেখা যাক্ ।

এ-বিষয়ে তারাশংকর বলেছেন — "এ ('চৈতালী-ঘূর্ণি') নিয়ে অনেকে আমাকে মার্কসবাদে প্রভাবান্বিত ব'লে ঠাউরেছেন । কিন্তু মার্কসের ক্যাপিটাল বা তাঁর লেখা কোনো বই আমি পড়িনি । এদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মার্কসবাদের উপর লেখা প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়েছি মাত্র । আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ; তা থেকেই আমি আমার উপলব্ধিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম ।"[৪২]

তিনি আরো বলেছেন —

"তবে মার্কসবাদের একটি তত্ত্ব অভিনব । এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে এইটুকু জেনেছি । এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে একটি সত্যের সন্ধান পেয়েছি , সেটি ভারতীয় সত্যের (কর্মফল তত্ত্ব) সঙ্গে সমন্বিত হবার অলঙ্ঘনীয় দাবি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে । সে হ'ল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি । সেই শক্তি যে কেমনভাবে ঠেলে নিয়ে চলেছে মানুষের সমাজকে , মানুষকে , সেই সত্যকে প্রবন্ধ মারফৎ জেনেছিলাম প্রথম । — তারপর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস সংগ্রহ ক'রে মিলিয়ে দেখে উপলব্ধি করেছিলাম এই তত্ত্বকে । কিন্তু তার বস্তুবাদ-সর্বস্বতাকে মানতে পারিনি । পথ এবং লক্ষ্যের বৈষম্যকেও আমি ভ্রান্তি এবং অপরাধ বলে মনে করি । মনে করি , এতেই নিহিত আছে তার ভবিষ্যৎ বিপদ । যদুবংশের বিপদের মতো ।"[৪৩]

উপরের উদ্ধৃতিদু'টিতে মার্কসবাদ সম্পর্কে তারাশংকরের যে ধারনা ব্যক্ত হয়েছে তা অনেক পরবর্তীকালের । ১৯৩১ সালে লেখা হ'ল 'চৈতালী-ঘূর্ণি'

আর 'আমার সাহিত্য-জীবন' (১ম) ১৯৫৩ সালে। তাই উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-র সমকালীন তারাশংকরের সমাজচিন্তার ছাপ নেই। তাই উপন্যাসের ভিতরের সাক্ষ্য নেওয়া যাক।

'উপাসনা'য় প্রকাশিত 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-র আদি পর্বে সুরেন ও শিবকালী —— চরিত্র দু'টি নেই। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এই চরিত্র দু'টি সংযোজিত হয়। এরা শ্রমিক-ইউনিয়নের সংগঠক। শ্রমিকদের মধ্যে চেতনা-সঞ্চারের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে এই দুই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী।

'চৈতালী-ঘূর্ণি'-তে যে শ্রমিক আন্দোলন বর্ণিত, তা আর্থিক দাবি-দাওয়ার সংকীর্ণ লড়াইয়ে গন্ডিবদ্ধ। শ্রেণী-সচেতনতাবোধ এখানে খুবই ক্ষীণ। "শ্রেণী-সচেতনতা সম্পর্কে তারাশঙ্করের ধারণার সঙ্গে মার্কসবাদী ধারণার তফাত আছে।"[৪৪]

'চৈতালী-ঘূর্ণি'-তে মজুরিবৃদ্ধি ও ওভারটাইমের দাবীতে শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছে। কিন্তু এই ধর্মঘট শ্রমিকদের শ্রেণী-সচেতনতাবোধ জাগ্রত করেনি, তাদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগায়নি, সর্বহারাশ্রেণীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক ভূমিকা বিষয়ে সচেতন ক'রে তোলেনি। অর্থাৎ 'তারাশঙ্করের আখ্যানে এমন কোনো আয়তন নেই যাতে এই খন্ড-সংগ্রাম সামাজিক সম্বন্ধ-বিন্যাসের সামগ্রিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে যায়।'[৪৫]

'চৈতালী-ঘূর্ণি'-তে আর্থিক সংকটে গ্রামের চাষী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু গোষ্ঠর মতো ধানকল-মজুরের মধ্যে আধুনিক প্রলেটারিয়েটের লক্ষণ সামান্যই রয়েছে। ধানকলের মজুরের জীবনে গ্রামীণ ও শহুরে অর্থনীতির টানাপোড়েন সক্রিয়। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার খুব বেশি প্রয়োগ ধানকলে নেই।

শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের দ্বন্দ্ব এখানে আর্থিক স্তর থেকে রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত হয়নি। এখানকার শ্রমিকদের পুঁজির-সঙ্গে-দ্বন্দ্বে-লিপ্ত শ্রেণী হিসেবে দেখি,

কিন্তু তারা আত্ম-সচেতন শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়নি। গোর্কির 'মা' উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সুতরাং 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-তে ব্যক্ত তারাশংকরের সমাজবীক্ষার সঙ্গে মার্কসবাদের যোগ সামান্যই।

শ্রমিক-চরিত্রায়ণে মার্কসীয় পথটি স্বাভাবিকভাবেই তারাশংকর অনুসরণ করেননি। গোষ্ঠর সাথে নিলডনা ('মা'-র কেন্দ্রীয় চরিত্র)-র তুলনা করা যায় এই সূত্রে। উপন্যাসের সূচনায় নিলডনা ছিলেন সাধারণী। ধীরে ধীরে তাঁর মনে বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ হ'ল। তিনি বুদ্ধি দিয়ে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে শিখলেন। তিনি পরিস্থিতি বদলের কর্মকাণ্ডে নামলেন। চেতনার এই ক্রম-জাগরণ গোষ্ঠর মধ্যে নেই। বিপ্লবী শ্রমিক চরিত্রের যোগ্য প্রতিনিধি গোষ্ঠ নয়।

অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট শ্রেণী-সচেতনতাবোধের জন্য 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-র কাঠামো-ও দুর্বল হয়েছে। উপন্যাসটি যেন স্পষ্টতই গোষ্ঠর পল্লীজীবন ও তার শ্রমিকজীবন —— এই দুই অংশে বিভক্ত। "গোষ্ঠর কৃষক-জীবনের তুলনায় তার শ্রমিক-জীবনের আখ্যান, মনে হয়, রিপোর্টাজধর্মী।"[৪৬] এর কারণ —— (১) 'তারাশংকর গ্রামের কৃষকের জীবন যতটা দেখেছিলেন শহরের মজুরদের জীবন ততটা দেখেননি। চাষীর জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে শ্রমিকের জীবনের অভিজ্ঞতার পার্থক্য এক্ষেত্রে শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগতও। (২) মাত্র ছ'মাস তারাশংকর কুলটি-কুঠিতে কাজ করেছেন। শ্রমিকজীবন সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা তখন তিনি অর্জন করেছেন তা ধান-কল-শ্রমিকের গল্প লেখায় তিনি প্রয়োগ করেছেন। (৩) তাছাড়া, যে-কল্পনা উপন্যাসের সব বিচ্ছিন্ন অংশ, ঘটনা, চরিত্রকে জোড়া দেয়, ঔপন্যাসিকের সেই কল্পনার ভূমিকা এখানে গৌণ।

মার্কসবাদের বদলে চৈতালী-ঘূর্ণিতে কি গান্ধীবাদ প্রশ্রয় পেয়েছে? আত্মস্মৃতিতে তারাশংকর লিখেছেন —— "১৯২১ সালে মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শগত রোমান্টিসিজম আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে আকর্ষণ করেছিলো প্রবলভাবে।"[৪৭]

কিন্তু ১৯২৮ - ২৯ সাল নাগাদ গান্ধীবাদে আস্থা কি তাঁর কিছুটা টলে গিয়েছিল ? উপন্যাসের ভিতরের সাক্ষ্য অন্তত তাই - ই দেয় ।

১। যে দু' টি চরিত্রকে গান্ধীবাদী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের ভাবনায় , কথায় , আচরণে গান্ধীবাদ মূর্ত হয়নি । অর্থাৎ সুরেন ও শিবকালী যথার্থ গান্ধীবাদী নয় ।

২। উপন্যাসে গান্ধীজীর স্বপ্নের 'স্বরাজ' নিয়ে কিছুটা ব্যঙ্গ , কিছুটা সমালোচনা করা হয়েছে — । যেমন —

(ক) 'স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার । শুধু বাণী পালন কর ।'[১৩০]

(খ) 'স্বরাজ - ফরাজ বুঝি না আমরা , মহাত্মা হাত থেকে বাঁচি কিসে তাই মহাত্মা বলুক ।'[১৩১]

৩। ১৯২৮ সালে প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৮৫) সংশোধন বিলের আলোচনায় বাংলা দেশের আইনসভায় কংগ্রেস সদস্যরা ভোট দিয়েছিলেন জমিদার - স্বার্থের পক্ষে । ফলে উত্তরকালে কংগ্রেস আন্দোলনে চাষীরা এগিয়ে আসেনি । উপন্যাসে হয়তো এর পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে ।

তাই 'চৈতালী - ঘূর্ণী' - তে গান্ধীবাদও পুরোপুরি গৃহীত হয়নি ।

(গ)

তারাশংকরের সাহিত্য - জীবনকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায় —

টি (১৯২২ - ৩০) , মধ্য (১৯৩০ -) ... (১৯৫০ -) ...

পর্বে তিনি ছোটগল্প লিখেছেন বেশি, উপন্যাস কম। দ্বিতীয় পর্বে বেশি উপন্যাস লেখা হয়েছে, ছোটগল্প কম। গুণগত দিক থেকেও প্রথম পর্বে ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাস নিম্নমানের, দ্বিতীয় পর্বে উপন্যাস ক্রমশ অধিকতর উন্নত হ'য়ে উঠেছে।

প্রথম পর্বে তারাশংকর ছোটগল্পকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করেছেন অন্তত দু'টি ক্ষেত্রে — 'শ্মশানের পথে' থেকে 'চৈতালী-ঘূর্ণি', 'স্রোতের কুটো' থেকে 'নীলকণ্ঠ'। পরবর্তীকালেও এই রূপান্তর সাধনের ধারা অব্যাহত থেকেছে। এর পিছনে আর্থিক তাগিদ কতটা ছিল বলা কঠিন, তবে অভিজ্ঞতার তাগিদ, শিল্পের তাগিদ অবশ্যই ছিল। বিশেষত অভিজ্ঞতার তাগিদ।

চাষী জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা হয়েছিল 'শ্মশানের পথে' গল্পটি। পরে এর সাথে কলিয়ারিতে চাকরির সূত্রে অর্জিত শ্রমিক-জীবনের অভিজ্ঞতাকে জুড়ে তারাশংকর লিখলেন তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'চৈতালী-ঘূর্ণি'। অভিজ্ঞতার প্রসার তাই লেখককে ছোটগল্পের সীমাকে ছাড়িয়ে উপন্যাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রবেশে প্রেরণা দেয়। কিন্তু ছোটগল্প হিসেবে 'শ্মশানের পথে' শিল্পের বিচারে যতটা সফল, উপন্যাস হিসেবে 'চৈতালী-ঘূর্ণি' ততটা সফল নয়।

'শ্মশানের পথে' প্রকাশের আগে তারাশংকরের ছ'টি ছোটগল্প 'পূর্ণিমা', 'কল্লোল', 'উপাসনা'য় প্রকাশিত হয়েছে। ছোটগল্পের শিল্প-মাধ্যমকে তিনি অনেকটা আয়ত্ত করে ফেলেছেন ততক্ষণে। অথচ 'চৈতালী-ঘূর্ণি' প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস বলেই উপন্যাসের রূপ-রীতি আয়ত্ত করতে তাঁর অসুবিধের প্রমাণ এতে ছড়িয়ে আছে। আবার এটি একটি গল্পেরই পরিবর্ধিত রূপ।

কিন্তু ছোটগল্প আর উপন্যাস এক নয়। গল্পকে টেনে বড় করলেই তা উপন্যাস হয়না, যদিনা গল্পের থীমে, ঘটনায়, চরিত্রে উপন্যাস হ'য়ে ওঠার

সম্ভাবনা থাকে। অন্যথায় একটি শিল্প-সফল ছোটগল্পকে বাড়িয়ে হয়ত একটি ব্যর্থ উপন্যাস তৈরী করা হয়।

এ-প্রসঙ্গে তারাশংকরের ছোটভাই পার্বতীশংকরের পুত্র অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন —— "কিছু কিছু গল্প লেখার পর তারাশঙ্কর তৃপ্ত হতে পারেন নি। অনেক কথা অনুক্ত রয়ে গেছে, চরিত্রের চালচিত্র যেন অস্পষ্ট থেকে গেছে —— সেক্ষেত্রে তিনি আবার গল্পটি পুনর্লেখনে ব্রতী হতেন, গল্পটি ডালপালা মেলে উপন্যাসের আকার নিত।"[৫০]

'শ্মশানের পথে' গল্পটিকে 'চৈতালী-ঘূর্ণি' উপন্যাসে রূপান্তরিত করার পশ্চাতে রয়েছে অভিজ্ঞতার বিস্তারকে বড় কাঠামোয় বাঁধার ইচ্ছে। "অভিজ্ঞতার বিস্তার দাবি করছে আখ্যান-কাঠামোর বিস্তার, যার সংস্থান নেই ছোটগল্পের শরীরে।"[৫১]

ঔপন্যাসিক জীবনের প্রথম পর্বে (১৯২৮-৩৮) তারাশংকর ছোটগল্পকে বাড়িয়ে উপন্যাসের চেহারা যতটা দিয়েছেন তুলনায় মধ্য পর্বে (১৯৩৯-৪৭) ততটা দেননি। তিনি যেন ক্রমে বুঝে নিয়েছেন —— 'ছোটগল্পের বিস্তারের সঙ্গে উপন্যাসের বিস্তারের তফাৎ শুধু পারিমাণিক নয়, গুণগত।'[৫২]

ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা যত বেড়েছে, উপন্যাসের নতুন আঙ্গিকে লেখকের দখলও ততই বেড়েছে। আঙ্গিকের বিকাশ যেমন লেখকের জীবনাভিজ্ঞতার ভাঙা-গড়াকে শিল্পিত রূপ দিয়েছে তেমনি অভিজ্ঞতার বিকাশ ও বিবর্তন আঙ্গিকের শৈল্পিক সিদ্ধির পথ চূড়ান্ত করেছে। এদের সম্পর্ক অন্যোন্য।

এ-বিষয়ে তারাশংকরের অপ্রকাশিত ডায়রির একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন শ্রী প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য্য তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধে যেখানে লেখক উপন্যাসের প্রথম পাঠকে

সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর সাথে এবং সংশোধিত ও বিবর্ধিত (সংশোধন মানেই বিবর্ধন) পাঠকে পূর্ণবিকশিত মানুষের সাথে তুলনা করেছেন। এ-বিষয়ে তারাশংকর তাঁর অপ্রকাশিত ডায়রিতে লিখেছেন —"সৃষ্টিগুলিকে অসমাপ্ত রেখে যে যায় —— সে প্রগতিশীল নয় —— অসহিষ্ণু, সার্থকতালোভী স্রষ্টা। তার সৃষ্টির মতো সেও অসম্পূর্ণ। সন্তান প্রসব করেই মায়ের কর্তব্য শেষ হয় না। তাকে সম্পূর্ণ মানুষ করে দেওয়ার পর —— তার মাতৃত্ব সার্থক সম্পূর্ণ হয়।" ৫৩

তারাশংকরের 'শ্মশানের পথে' গল্পটি ঘটনাবহুল; চরিত্রের বৈচিত্র্যও এখানে প্রদর্শিত। তবু শেষ পর্যন্ত গল্পটিতে 'ভাবমুখ্যতা' বা 'ইমপ্রেশন' বড় হয়েছে। কারণ সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ অর্থনীতির ভাঙন দেখানোই তাঁর 'মোটিফ্' (motif)। এই 'মোটিফ্' সফল করতে গল্পে কৃষক গোষ্ঠের ওপর কাবুলিওয়ালা, মহাজন, জমিদারের পেয়াদার অত্যাচারের ঘটনাগুলি সন্নিবেশ করা হয়েছে। গল্পটিতে মানবিক সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে সুবল চরিত্রটিকে দিয়ে। আর্থিক সংকট যে নৈতিকতার সংকট সৃষ্টি করে তা দেখানো হয়েছে দামিনীর জীবনে। লেখকের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক সংকটের চেয়ে নারীত্বের নৈতিক সংকটও কম গুরুত্বের নয়। আবার আর্থিক সংকটই নৈতিক সংকটের কারণ। লেখকের মোটিফই গল্পটিকে সংহতি দিয়েছে। ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে চরিত্রকে ধ্বংসের শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ধ্বংসের দিকে কৃষকের অনিবার্য গতির প্রতীক হ'য়ে উঠেছে প্রসরমাণ শ্মশান। আগ্রাসী শ্মশানের কথায় গল্পটির সাংকেতিক পরিসমাপ্তি।

গল্পটিকে যখন উপন্যাসে পরিবর্ধিত করা হ'ল তখন লেখকের মোটিফে নতুন মাত্রা যুক্ত হ'ল —— ধনতান্ত্রিক যন্ত্রনির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামোয় শ্রমজীবী শ্রেণীর সংকট প্রদর্শন। ফলে লেখক মুখ্য চরিত্র গোষ্ঠকে কৃষক থেকে শ্রমিকে রূপান্তরিত করেন, তাকে নিয়ে যান আধা-শহরে। জমিদারের পেয়াদাকে হত্যার নাটকীয় ঘটনা এজন্যই উপন্যাসে আনা হয়েছে —— যাতে গোষ্ঠ বাধ্য হয়েছে দামিনীকে নিয়ে শহরে পালাতে।

'চৈতালী-ঘূর্ণি' রচনার সমকালে বীরভূম জেলার বোলপুর, সাঁইথিয়া প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রে চালের কল স্থাপিত হয়েছে। লাভপুরেও চালের কল স্থাপনের উদ্যোগ হচ্ছে। সেই সব কলের যারা মজুর তারা আসছে আশপাশের অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষকদের মধ্য থেকে। সুস্পবিত্ত কৃষক জমিদার – মহাজনের অত্যাচারে ভূমিহীন ও বিত্তহীন হ'য়ে নগদ পয়সা উপার্জনের আশায় ও সচ্ছল জীবনযাপনের মরীচিকায় এই সদ্য-স্থাপিত কলের দিকে ছুটছে —— এই সত্য তাঁর অভ্রান্ত দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। এই অভিজ্ঞতাই তারাশংকরকে ভূমিহীন কৃষক গোষ্ঠকে আধা-শহরে এনে চালকলের মজুরে পরিণত করতে প্রেরণা যোগায়।

'শ্মশানের পথে' গল্পটির সাথে 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-র প্রথমার্ধের (গোষ্ঠের কৃষকজীবন) প্রায় রেখায় রেখায় মিল। বর্ণনাকে কোথাও একটু বাড়ানো হ'য়েছে, দু'একটি ঘটনা (যেমন মহাজন কর্তৃক গোষ্ঠর জমি দখল, গোষ্ঠর বাধা দেওয়া ইত্যাদি) যুক্ত হ'য়েছে, —— এই মাত্র প্রভেদ। সংলাপে কথ্য ভাষা প্রয়োগে উভয় ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। উপন্যাসের সংলাপে কথ্য ভাষা প্রয়োগে শিষ্টতা বজায় রাখা হয়েছে। অন্যদিকে গল্পের সংলাপের (ও গানের) ভাষায় গ্রাম্য সুর স্পষ্ট —— যেমন,

সংলাপ

শ্মশানের পথে

দামিনী — 'তখন যে কাপড় নিতে মানা করেছিলাম।'

চৈতালী - ঘূর্ণি

দামিনী — 'তখন যে কাপড় কিনতে মানা করেছিলাম।'

শ্মশানের পথে

গোষ্ঠ — 'সি তো তোমার লেগেই'।

চৈতালী - ঘূর্ণি

গোষ্ঠ — 'সে তো তোমার জন্যই।'

এমন নমুনা অনেক।

গানে

শ্মশানের পথে

'ভেয়ের সগ বৌ নিয়েছে, বুন হয়েছেন সুখের কাঁটা
বৌ-এর বেলায় শাঁখা-সাড়ী, বুনের বেলায় মুড়ো ঝাঁটা।'

চৈতালী - ঘূর্ণি

'ভাইয়ের সোহাগ বউ নিয়েছে, বোন হয়েছে সুখের কাঁটা
বউয়ের বেলা শাঁখা শাড়ি, বোনের পিঠে মুড়ো ঝাঁটা।'

'শ্মশানের পথে' ছিল তিন দিনের কাহিনী। নবতর অভিজ্ঞতাকে আকার দিতে গিয়ে এই সময়-পরিধিকে বাড়ানো হয়েছে কয়েক বছরে। হয়ত অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরবর্তী কোনো সময় পর্যন্ত। কালের আয়তন প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ধিত হয়েছে দেশের মাত্রা আর অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে সমাজবীক্ষা। ফলে যা ছিল একটি নিটোল ছোটগল্প তা' ডালপালা মেলে ধীরে ধীরে একটি উপন্যাসের চেহারা পায়। গল্পে তথা উপন্যাসের প্রথম পর্বে ধ্বংসের দিকে গ্রাম-সমাজ ও গ্রামীণ অর্থনীতির গতি দেখাতে গিয়ে আগ্রাসী শ্মশানের প্রতীককে বারবার প্রয়োগ করা হয়েছে আর উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে শ্রমিক-জীবনের সংকট এবং শোষণ ও অত্যাচার প্রতিরোধে শ্রমিকদের ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে ওঠাকে চৈতালী-ঘূর্ণির প্রতীকে রূপ দেওয়া হয়েছে। ফলে গঠনের দিক থেকে উপন্যাসটি দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে গেছে।

দু'টি অংশের মধ্যে যেন ঐক্য সৃষ্টি করা যায় নি — প্লটের দিক থেকেও নয়, চরিত্রের বিকাশের দিক থেকেও নয়, থীমের দিক থেকে তো নয়ই। গোষ্ঠর কৃষকজীবন যতটা বিশ্বাস্য ও বাস্তবধর্মী হয়েছে তার শ্রমিকজীবনের কথা ততটা বাস্তবরসে জারিত হয়নি। শ্রমিকজীবন সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা থেকে উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধ গড়ে উঠেছে। লেখকের যে কল্পনাশক্তি জীবনের বিবিধ তথ্য ও উপকরণকে একসূত্রে গেঁথে প্রাণবন্ত করে তোলে তার অভাব দ্বিতীয়ার্ধে স্পষ্ট। অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে গোষ্ঠ ও অন্যান্য শ্রমিকদের প্রতিরোধ তাদের চেতনার জাগরণ বা শ্রেণীসচেতনতাবোধের স্মারক নয়। তাছাড়া গোষ্ঠ যে শ্রমিকদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও আত্মবিসর্জন দেয় তার প্রেরণা তার মধ্যে কিভাবে জেগেছে তার স্তর বিন্যাস ঔপন্যাসিক করেন নি। ফলে শ্রমিকদের এই জাগরণ চৈতালী-ঘূর্ণির সঙ্গেই উপমিত হয়, কালবৈশাখীর সঙ্গে নয়। এ-প্রসঙ্গে 'প্রবাসী'-তে প্রিয়রঞ্জন সেন লিখেছিলেন— "কলের শ্রমিক ধর্মঘটে বইখানি শেষ হইয়াছে; নায়ক গোষ্ঠ পুলিসের গুলি খাইয়া মরিয়াছে। লেখক এই ঘটনাকে 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-র সহিত তুলনা করিয়া আশা করিয়াছেন কালবৈশাখী আসিবে। চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি অগ্রদূত কালবৈশাখীর। অপেক্ষা করিয়া দেখা যাউক কি হয়? কালবৈশাখী আসে কিনা।"[৫৪]

'শ্মশানের পথে' গল্পটি যে শেষ পর্যন্ত 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-তে রূপান্তরিত হ'ল তার কারণ লেখকের সমাজবীক্ষায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। তাঁর সমাজবোধ পূর্ণতা লাভ করছিল। 'শ্মশানের পথে'-র থীম ছিল চাষীর ধ্বংস হ'য়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া আর 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-র বিষয় চাষীর শ্রমিকে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া ও অঙ্কুরিত শ্রমিক-আন্দোলন। 'শ্মশানের পথে'-র বদলে 'চৈতালী-ঘূর্ণি' নাম দেওয়া থেকে বোঝা যায় যে কালান্তরে লেখক শ্মশানের প্রতীকের বদলে চৈতালী-ঘূর্ণি প্রতীকের ওপর জোর দিতে চান। সমাজ-বদলের প্রক্রিয়ায় শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা সম্পর্কে লেখকের ধারণা ক্রমশ স্পষ্ট চেহারা নিচ্ছে। তবু দ্বিতীয়ার্ধের কাহিনী-ও চরিত্র-বিন্যাসে জীবনরসের বড়ো অভাব।

উপন্যাসের প্রথমাংশ থেকে অনেকটা অবধি গোষ্ঠ ও দামিনী — কৃষক ও তার পত্নী-র চোখ দিয়ে জীবন ও জগতকে দেখেছেন তারাশংকর। শেষাংশে দেখেছেন মধ্যবিত্ত শ্রমিক-নেতা শিবকালীর চোখ দিয়ে। গোষ্ঠ-তারাশংকরের একাত্মতা রূপান্তরিত হয়েছে শিবকালী - তারাশঙ্করের একাত্মতায়। উপন্যাসের দৃষ্টিবিন্দু সরে গেছে চাষী থেকে মধ্যবিত্তে। আর সেইজন্যই উপন্যাসে ভাষাও গল্প থেকে অনেকটা পাল্টে গেছে।

'চৈতালী-ঘূর্ণি' প্লট-প্রধান উপন্যাস। প্লট সম্পর্কে বলা হয়েছে — "প্লট হলো কাহিনীর পরিণতি সম্পর্কে এক ধরনের পূর্বচিন্তা। উপন্যাসের কাহিনীতে এই পূর্বচিন্তা সুকৌশলে আরোপিত হয়ে সমস্ত ঘটনাগুলিকে পারস্পরিক যোগসূত্রে নিবদ্ধ করে একটি গ্রন্থিবদ্ধ সামগ্রিকতার আভাস দেয়।"[৫৫] 'চৈতালী - ঘূর্ণি'-তে কাহিনীর গতি ও পরিণতি লেখকের পূর্বসিদ্ধান্তের (অর্থনৈতিক শোষণের স্বরূপ প্রকাশ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ) চাপে যান্ত্রিক গতিতে পরিচালিত হয়েছে এবং উপন্যাসে আরোপিত সমস্ত ঘটনা পারস্পরিক যোগসূত্রে নিবদ্ধ হ'য়ে এক গ্রন্থিবদ্ধ সামগ্রিকতা রূপ লাভ করেছে।

'চৈতালী-ঘূর্ণি' ঘটনা-প্রধান উপন্যাস। কিন্তু কাহিনীর শুরুতেই ঘটনার আবর্ত রচনা করা হয়নি। ঘটনার পরিবেশ সম্পর্কে পাঠককে সচেতন ক'রে তুলে লেখক ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। অর্থনৈতিক শোষণের স্বরূপ প্রকাশ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ — এই পূর্বসিদ্ধান্তের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে সামাজিক ও আর্থিক সংঘাতগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে এভাবে —

১। ঋণের টাকা নিয়ে কাবুলিওয়ালা ও গোষ্ঠের সংঘাত ;

২। জমিবন্দকী টাকা নিয়ে মহাজন ও গোষ্ঠের সংঘাত ;

৩। জমির খাজনা নিয়ে জমিদারের চাপরাসী ও গোষ্ঠের সংঘাত ;

৪। কম মজুরীর প্রতিবাদে মিলমালিক ও শ্রমিকের সংঘাত।

উপরোক্ত সংঘাতগুলি **Climax** -এ পৌঁছয় শ্রমিক ধর্মঘটে ও শ্রমিক - মালিক সংঘর্ষে। শ্রমিকের মৃত্যুতে ও আগামী দিনের বৃহত্তর সংঘর্ষের সংকেত দিয়ে উপন্যাস শেষ হয়।

উপন্যাসের আদি অংশে গ্রামীণ শোষণের চরিত্র-উন্মোচন ও কৃষকের সর্বস্বান্ত হয়ে যাবার কথা বলার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঘটনাগুলিকে সাজানো হয়েছে। জমিদার, মহাজন, কাবুলিওয়ালা-র শোষণ দেখানো হয়েছে কিছু নির্বাচিত ঘটনার মধ্য দিয়ে। গোষ্ঠর আর্থিক সংকট ও মানবিক সংকট চরমে পৌঁছেছে তার পুত্রের মৃত্যুর ঘটনায়। ধীরে ধীরে গোষ্ঠের জীবনে যে **Crisis** দানা বেঁধেছে তা **Climax** -এ পৌঁছেছে জমিদারের চাপরাসীকে হত্যার ঘটনায়। গোষ্ঠ বাধ্য হয়েছে দামিনীকে নিয়ে গ্রাম ছাড়তে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের যান্ত্রিক বর্ণনাকে মানবরসে জারিত করার জন্য গোষ্ঠ-দামিনী-সুবলের ত্রিভুজ উপস্থাপিত। আবার এ-উদ্দেশ্যেই দামিনীর অন্তর্দ্বন্দ্বের উপস্থাপনা। অভাবগ্রস্তা দামিনী সুবলের কাছে হাত পেতেছে। পরক্ষণেই স্বাভাবিক সংস্কার তাকে সুবলের কাছ থেকে দূরে নিয়ে এসেছে। আর্থিক সংকটের সঙ্গে লেখক জুড়ে দিয়েছেন মনের সংকটকে, নারীত্বের সংকটকে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশে ভূমিহীন কৃষকের মজুর হওয়া এবং ধনতান্ত্রিক শোষণের চরিত্র বর্ণনার লক্ষ্যে ঘটনাগুলি নির্বাচিত ও উপস্থাপিত। মিল-মালিককে দেখানো হয়নি। (যেমন প্রথম অংশে জমিদারকে দেখানো হয়নি।)

('উপাসনা' পত্রিকায় ধৃত পাঠে মাড়োয়াড়ি মালিকের একটি স্টিরিওটাইপ ছিল, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তা বর্জিত হয়।)

বস্তি - জীবনের ছবি লেখক বিশ্বস্ততার সঙ্গে এঁকেছেন । শ্রমিক - জীবনের সংকট চরমে পৌঁছয় ধর্মঘটে । তারপর ধর্মঘট ভাঙে । দু' দল শ্রমিকে সংঘর্ষ বাধে । গোষ্ঠের মৃত্যু হয় । শ্রমিকদের ব্যাপক জাগরণের ইংগিত দিয়ে কাহিনী শেষ হয় ।

তারাশঙ্কর - চরিত্র সৃজনের দিক দিয়ে 'শ্মশানের পথে' ও 'চৈতালী - ঘূর্ণি' - তে খুব বেশি সফল হন নি । গোষ্ঠ প্রথমত কৃষক ও দ্বিতীয়ত শ্রমিকের স্টিরিওটাইপ । গ্রামের শোষক চরিত্রগুলি **flat.** কাবুলিওয়ালা, মহাজন, জমিদারের চাপরাশী যেন শোষণ ও উৎপীড়নের যন্ত্র । খানিকটা জটিলতার স্পর্শ রয়েছে দামিনীতে । তাও খুবই সামান্য । দ্বিতীয়াংশেও মালিক - পক্ষের লোকেরা এবং শ্রমিক পক্ষের লোকেরা একরঙা চরিত্র । অন্য রঙের ইশারা দেখি বড় মিস্ত্রীর চরিত্রে । মজুর চরিত্রগুলি যেন মজুরশ্রেণীর নানান্ **type.** ব্যক্তিচরিত্রের বদলে শ্রেণীচরিত্রের দিকেই লেখক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ।

তবু সামগ্রিক বিচারে সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশংকরের বর্ণিত মজুর - জীবনের কাহিনীর মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ——

"অন্যান্য লেখক শ্রমিকদের দুর্গতি বর্ণনা করিতে কেবল তথ্য - সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহাদের অবস্থা - দৈন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন ও তাহাদের রিক্ত, ভাগ্য - বিড়ম্বিত জীবন - কাহিনীতে করুণ রস সঞ্চার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন । কিন্তু তারাশঙ্করের ভাষার শুষ্ক কঠোর ভাব - ব্যঞ্জনাশক্তি ইঁহাদের নাই ; ভাষার এই সাঙ্কেতিকতার সাহায্যে তিনি এক ধূসর, উদাস, মরুভূমির ন্যায় জ্বালাময়, ছায়ালেশহীন জীবন - প্রতিবেশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন ।"[৫৬]

তারাশংকরের সাহিত্য-ধারা দু'দিক দিয়ে বয়ে গেছে। 'রসকলি' ও 'কবি' এক ধারার আদিতে আর 'চৈতালী-ঘূর্ণি' আর এক ধারার সূচনায়। প্রথম ধারায় পরে এসেছে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' দ্বিতীয় ধারায় পরে এসেছে 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'গণদেবতা' প্রভৃতি। সেদিন থেকে তারাশংকরের সাহিত্য-ধারায় 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-র গুরুত্ব অসীম। উপন্যাস হিসেবে 'চৈতালী-ঘূর্ণি' শিল্প-সফল না হ'লেও তারাশংকরের সমগ্র সাহিত্য-জীবনে এর ভূমিকা পর্যালোচনার যোগ্য। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'শনিবারের চিঠি'-তে 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-কে 'ওঁর সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির **'Epitome'** বলে মন্তব্য করেছিলেন। যে গ্রামীণ সমাজ ও তার ভাঙন — তারাশংকরের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের সাহিত্যকর্মের কেন্দ্রীয় বিষয় - তার প্রথম প্রকাশ ঘটল 'চৈতালী-ঘূর্ণি'-তে। যদিও গল্পে এ বিষয়ের চর্চা আগেই শুরু হয়েছে 'স্রোতের কুটো' ও 'শ্মশানের পথে' গল্পে। তাই "চৈতালী-ঘূর্ণি' তারাশঙ্করের শুধু প্রথম উপন্যাস নয়, তাঁর জগতে প্রবেশের প্রশস্ততম দরজাও বটে।"[৫৭]

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য-জীবন (১ম খণ্ড), 'স্মৃতিকথা' (বৈশাখ, ১৩৯৪), পৃ: - ৩১৫।

২। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য্য : সমাজের যাত্রা এবং তারাশংকরের উপন্যাস : 'চৈতালী-ঘূর্ণি' : এক্ষণ : শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮২, পৃ: - ৫৭।

৩। তদেব, পৃ - ৫৭।

৪। Subhas Chandra Bose : Collected Works, Vol.-II, P.- 134.

৫। Sumit Sarkar : Modern India, (1984), P. - 241.

৬। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য-জীবন (১ম খণ্ড), স্মৃতিকথা (বৈশাখ, ১৩৯৪), পৃ: - ৩২৭।

৭। তদেব, পৃ: - ৩২৮।

৮। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা, স্মৃতিকথা (বৈশাখ, ১৩৯৪), পৃ: - ৬।

৯। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য-জীবন (১ম), স্মৃতিকথা (বৈশাখ, ১৩৯৪), পৃ: - ৩৯৩।

১০। তারাশংকরের গল্পগুচ্ছ : ১ম খণ্ড, জুলাই, ১৯৮৬, পৃ: - ৮০।

১১। তদেব, পৃ: - ৮৪।

১২। তদেব, পৃ: - ৯০।

১৩। তারাশংকরের গল্পগুচ্ছ : ১ম খণ্ড, জুলাই, ১৯৮৬, পৃ: - ৯৩ ।

১৪। তদেব, পৃ: - ৯৩ ।

১৫। তদেব, পৃ: - ৯৩ ।

১৬। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য-জীবন (১ম), স্মৃতিকথা, (বৈশাখ, ১৩৯৪), পৃ: - ৩২৮ ।

১৭। তদেব, পৃ: - ৩২৮ ।

১৮। তদেব, পৃ: - ৩১৫ ।

১৯। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য্য : সমাজের যাত্রা এবং তারাশংকরের উপন্যাস 'চৈতালী-ঘূর্ণি' : এক্ষণ : শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮২, পৃ: - ৫৯ ।

২০। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য-জীবন (১ম খণ্ড), স্মৃতিকথা, (বৈশাখ, ১৩৯৪), পৃ: - ৩৬৩ ।

২১। তারাশংকর রচনাবলী : প্রথম খণ্ড : মিত্র ও ঘোষ : ১৩৮৬, পৃ: - ৫ ।

২২। তদেব, পৃ: - ২৩ ।

২৩। তদেব, পৃ: - ২৯ ।

২৪। তদেব, পৃ: - ৩৪ ।

২৫। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : গ্রামের চিঠি ; যুগান্তর : ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৩।

২৬। তারাশংকর রচনাবলী : প্রথম খণ্ড : মিত্র ও ঘোষ : ১৩৮৬, পৃ: - ৪৩ ।

২৭। তদেব, পৃ: - ৪৩ ।

২৮। তারাশংকর রচনাবলী : প্রথম খন্ড : মিত্র ও ঘোষ : ১৩৮৬, পৃ:- ৪৪ ।

২৯। তদেব, পৃ:- ৪৪ ।

৩০। তদেব, পৃ:- ৫৩ ।

৩১। তদেব, পৃ:- ৫৯ ।

৩২। তদেব, পৃ:- ৫৯ ।

৩৩। তদেব, পৃ:- ৬০ ।

৩৪। তদেব, পৃ:- ৬০ ।

৩৫। তদেব, পৃ:- ৬০ ।

৩৬। তদেব, পৃ:- ৬৩ ।

৩৭। তদেব, পৃ:- ৬৫ ।

৩৮। তদেব, পৃ:- ৬৫ ।

৩৯। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য্য : সমাজের যাত্রা এবং তারাশংকরের উপন্যাস 'চৈতালী-ঘূর্ণি' : এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮২, পৃ:- ৬৭ ।

৪০। তারাশংকর রচনাবলী : প্রথম খন্ড : মিত্র ও ঘোষ : ১৩৮৬, পৃ:- ৬৬ ।

৪১। তদেব, পৃ:- ৮২ ।

৪২। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য-জীবন (১ম), স্মৃতিকথা (বৈশাখ, ১৩৯৪), পৃ:- ৩৬৩ ।

৪৩। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য-জীবন (১ম), স্মৃতিকথা (বৈশাখ , ১৩৯৪), পৃ:— ৩৬৩-৩৬৪ ।

৪৪। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য্য : সমাজের যাত্রা এবং তারাশংকরের উপন্যাস 'চৈতালী-ঘূর্ণি' : এক্ষণ , শারদীয় সংখ্যা- ১৩৮২ , পৃ: - ৫৯ ।

৪৫। তদেব , পৃ: - ৬৮ ।

৪৬। তদেব , পৃ: - ৭১ ।

৪৭। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য-জীবন (১ম), স্মৃতিকথা , (বৈশাখ , ১৩৯৪) , পৃ: - ৩১৫ ।

৪৮। তারাশংকর রচনাবলী : প্রথম খন্ড : মিত্র ও ঘোষ : ১৩৮৬ , পৃ: - ২৩ ।

৪৯। তদেব , পৃ: - ২৩ ।

৫০। জলার্ক , তারাশংকর সংখ্যা ২ , একাদশ সংকলন (মাঘ ১৩৯০-চৈত্র ১৩৯১), তারাশংকরকে : কাছ থেকে — অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় , পৃ: - ৬৭ ।

৫১। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য্য : 'ঔপন্যাসিকের আত্মপরিচয় ও আত্মগঠন : তারাশংকর' : পরিচয় , শারদীয় সংখ্যা , ১৩৮৭ , পৃ: - ২০৫ ।

৫২। তদেব , পৃ: - ২০৬ ।

৫৩। তদেব , পৃ: - ২০৬ - ৭ ।

৫৪। তারাশংকর রচনাবলী : প্রথম খণ্ড : মিত্র ও ঘোষ ; ১৩৮৬ ,
গ্রন্থ-পরিচয় , পৃ: - ৪৬১ ।

৫৫। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার — উপন্যাসে জীবন ও শিল্প , পৃ: - ২৭ ।

৫৬। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা , ১৩৭২ ,
পৃ: - ৫৩৩ ।

৫৭। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য্য : 'সমাজের যাত্রা এবং তারাশংকরের উপন্যাস
'চৈতালী-ঘূর্ণি' : একণ , শারদীয় সংখ্যা ,
১৩৮২ , পৃ: - ৫২ ।